নব সাম্রাজ্যবাদ কাহাকে বলে (New Imperialism and its causes) : ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে সাম্রাজ্যবাদের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন যুগে মহাবীর আলেকজান্ডার দি গ্রেট ও জুলিয়াস সিজার, মধ্যযুগে চিঙ্গীজ খান, আধুনিক যুগে নেপোলিয়ন বোনাপার্ট প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী বিজেতার নাম করা যায়। তবে এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ ছিল ভৌমিক অধিকার (Territorial domination) স্থাপনের চেষ্টা মাত্র। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ বলতে যা বোঝায় তা এই ধরনের সাম্রাজ্যবাদ থেকে পৃথক। আধুনিক সাম্রাজ্যবাদকে নব-সাম্রাজ্যবাদ (New Imperialism) বলা চলে।[১] ১৮৭০ খ্রীঃ পর থেকে ইওরোপের বৃহৎ অথবা শিল্পায়ত জাতিগুলি, ইওরোপের বাইরে বিশেষতঃ পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকায় উপনিবেশ দখলের জন্যে যে উন্মাদ প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হয়; যার ফলে, ইওরোপের বাইরের অনধিকৃত, অনাবিষ্কৃত, কাঁচামাল-সমৃদ্ধ এবং সম্ভাব্য বাজার যুক্ত দেশগুলি ইওরোপীয় জাতিগুলির উপনিবেশে পরিণত হয় তাকেই নব সাম্রাজ্যবাদ (New Imperialism) বলা হয়।

আধুনিক সাম্রাজ্যবাদ কাহাকে বলে

১৮৭০ খ্রীঃ পর উদ্ভূত এই নব সাম্রাজ্যবাদের আগে ৪০০ বছর ধরে স্প্যানিশ, ডাচ, ইংরাজ, ফরাসী প্রভৃতি সামুদ্রিক জাতি এবং অষ্ট্রিয়ার হ্যাপসবার্গ, রাশিয়ার জার প্রভৃতি স্থলশক্তি গুলিও উপনিবেশ বিস্তারে রত ছিল। কিন্তু এই প্রাক ১৮৭০ খ্রীঃ যুগে উপনিবেশ স্থাপনে সরকারগুলির তেমন আগ্রহ ছিল না, জনমতও এ ব্যাপারে উদাসীন ছিল। এমনকি ১৮২০ খ্রীঃ মধ্যে ফ্রান্স ও স্পেনের অধিকাংশ উপনিবেশ হাত ছাড়া হলেও এই দেশগুলি তাতে চিন্তিত হয়নি। ১৮২২ খ্রীঃ ব্রাজিল পর্তুগালের হাতছাড়া হয়। ব্রিটেন, আমেরিকার ত্রয়োদশ উপনিবেশ হারায়। তথাপি এ্যাডাম স্মিথ বলেন যে—উপনিবেশ রক্ষার জন্যে ব্যয়, উপনিবেশের আয় অপেক্ষা বেশী। গ্ল্যাডস্টোন উপনিবেশগুলিকে মুক্ত করার কথা বলেন (১৮৫২ খ্রীঃ)। ডিসসরেইলী বলেন যে, "এই হতভাগ্য উপনিবেশগুলি শীঘ্রই মুক্ত হবে। এগুলি ব্রিটেনের গলায় ভারী পাথরের মতই ঝুলে আছে।" মোট কথা ১৮৭০ খ্রীঃ পর্যন্ত একটি উপনিবেশ বিরোধী মনোভাব প্রবল ছিল।

১৮৭০ খ্রীঃ পর অকস্মাৎ নাটকীয়ভাবে এই উপনিবেশ বিরোধী মনোভাব লুপ্ত হয়। শকুনি যেরূপ মৃতদেহের ওপর আকাশ থেকে অকস্মাৎ ঝাঁপিয়ে পড়ে, ইওরোপীয় জাতিগুলি এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলিকে নিজ নিজ উপনিবেশে পরিণত করার জন্যে সেরূপ ঝাঁপ দেয়। কোন ভাল জিনিস দখলের জন্যে লোকে যেরূপ কাড়াকাড়ি করে, সেরূপ উপনিবেশ দখলের জন্যে কাড়াকাড়ি (scramble) আরম্ভ হয়। ১৮৭০-১৯১৪ খ্রীঃ পর্যন্ত সময়কালকে এজন্য Age of imperialism বা সাম্রাজ্যবাদের যুগ বলা হয়। এই নব সাম্রাজ্যবাদ (New Imperialism) দৈত্যের ন্যায় জেগে ওঠে।

১৮৭০ খ্রীঃ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভবের কারণ (The Causes of the rise of Imperialism) : ১৮৭০ খ্রীঃ পর সাম্রাজ্যবাদের বিস্ফোরণের জন্যে পণ্ডিতেরা নানাবিধ কারণ দেখান। ব্রিটিশ অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক জে· এ· হবসন (J. A. Hobson) তাঁর

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism a Study) গ্রন্থে (১৯০২ খ্রীঃ) সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন। হবসন বলেন যে, নব সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাতে কোন উচ্চতর লক্ষ্য ছিল না। অর্থনৈতিক লক্ষ্যই ছিল এই নব উপনিবেশবাদের মূলে। হবসনের মতে, এই পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় পুঁজিবাদীরা মুনাফা ভোগ করে বহু মূলধন জমা করে। এর ফলে মূলধনের পাহাড় জমে যায় (Glut of Capital)। এই মূলধন উপনিবেশে বিনিয়োগ করে আরও মুনাফা বৃদ্ধির জন্যে মূলধনীরা তাদের নিজ দেশের সরকারকে উপনিবেশ দখলে বাধ্য করে। উপনিবেশের নতুন শিল্পে মূলধন লগ্নী দ্বারা মূলধনী শ্রেণী মুনাফার পাহাড় জমায়। উপনিবেশের কাঁচামাল ও বাজারকে একচেটিয়া দখল করে তারা ফুলে ফেঁপে ওঠে। সুতরাং নব সাম্রাজ্যবাদের মূল অর্থনৈতিক শিকড় ছিল উপনিবেশে লগ্নীর জন্যে "বাড়তি মূলধনের চাপ" (The economic tap root of imperialism was glut of capital in search of investment)। অর্থাৎ বাড়তি মূলধনের চাপই সাম্রাজ্য বা উপনিবেশ দখলের মূল কারণ।

হবসনের মতে, এই ব্যবস্থার প্রতিকার করতে হলে ধনবণ্টন দ্বারা মূলধনী শ্রেণীর বাড়তি মূলধনকে দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করা দরকার এবং সমাজের বিভিন্ন উন্নয়নশীল কাজে এই মূলধন বিনিয়োগ করা দরকার। যদি লোকের জীবনযাত্রার মান বাড়ে, তবে তারা কলকারখানায় তৈরি বাড়তি জিনিস কিনে উদ্বৃত্ত মালকে ব্যবহার করতে পারবে। ফলে উদ্বৃত্ত মালের বিক্রির জন্যে আর উপনিবেশের দরকার হবে না।

হবসন কর্তৃক সাম্রাজ্যবাদের পন্থা ব্যাখ্যা

নব সাম্রাজ্যবাদ উদ্ভবের জন্যে হবসন যে ব্যাখ্যা দিয়াছেন, অনেকে তার সমালোচনা করেন। শিল্প-বিপ্লবের পর শিল্প মালিকদের মূলধন স্ফীতির ফলে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব হয় হবসন একথা বলেছেন। কিন্তু শিল্প-বিপ্লবের আগের যুগে কেন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়, তার ব্যাখ্যা হবসন দেন নি। ১৮৭০ খ্রীঃ নব সাম্রাজ্যবাদ দেখা দিলে তা ব্যাখ্যা করার জন্যে হবসন উপরোক্ত উদ্বৃত্ত মূলধনের যুক্তি দেন। হবসন পরে বুঝেছিলেন যে তাঁর ব্যাখ্যা অতি সরলীকরণ দোষে দুষ্ট।[১] হবসনের মতবাদের ত্রুটি যাই থাকুক, তবুও একথা সত্য যে, মূলধনের স্ফীতি এবং বাজার দখলের ইচ্ছা সাম্রাজ্যবাদকে জোরদার করে। শিল্প-বিপ্লব এবং ধনতন্ত্রবাদ সাম্রাজ্যবাদের পথ প্রস্তুত করে। সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা অনেকাংশে সত্য।

হবসনের তত্ত্বের দুর্বলতা

বিখ্যাত রুশ কমিউনিস্ট নেতা লেনিন, তাঁর "সাম্রাজ্যবাদ হল ধনতন্ত্রবাদের সর্বোচ্চ স্তর" (Imperialism, the Highest Stage of Capitalism) নামক গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাকে আরও বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। লেনিনের মতে, ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদের ভেতরেই সাম্রাজ্যবাদের বীজ নিহিত আছে। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলির বৈদেশিক নীতি পুঁজিবাদীশ্রেণীর স্বার্থেই পরিচালিত হয়। অধিক মুনাফার আশায় শিল্প মালিকরা দেশের লোকের প্রয়োজন অপেক্ষা বাড়তি মাল উৎপাদন করে। এই বাড়তি মাল বিক্রয় এবং সস্তায় কাঁচামাল পাওয়ার জন্যে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র উপনিবেশ দখল করে। বিশ্বে উপনিবেশের সংখ্যা সীমিত। পুঁজিবাদী দেশগুলি উপনিবেশ দখলের চেষ্টা করায় বিভিন্ন দেশের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ হল পুঁজিবাদী অর্থনীতির চূড়ান্ত পরিণতি। লেনিন প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কারণ হিসেবে বিভিন্ন পুঁজিবাদী শক্তির উপনিবেশ দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতাকে দায়ী করেন। লেনিনের মতে, ধনী বুর্জোয়া দেশের লোকেরা উপনিবেশের দরিদ্র শ্রমিকদের তাদের শাসনের দ্বারা শোষণ করে। বুর্জোয়া দেশের শ্রমিকশ্রেণী উপনিবেশের আয়ে বেশী মজুরী পাওয়ার আশায় এই শোষণের সামিল

সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব সম্পর্কে লেনিনের অভিমত

পুঁজিবাদী শিল্পের ফল

হয়। তারা ভুলে যায় যে, তাদের এই সুবিধা হল সাময়িক।সাম্রাজ্যবাদের জন্যে লেনিন যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন এর মূল কথা হল : (১) নতুন বাজার দখল অপেক্ষা মূলধনের বিনিয়োগের জন্যেই উপনিবেশ দখলের আগ্রহ বাড়ে। (২) পুঁজিবাদী অর্থনীতির পরিণামই হল সাম্রাজ্যবাদ। (৩) নিজ দেশের শ্রমিক অপেক্ষা অনগ্রসর উপনিবেশের শ্রমিকদের শোষণ পুঁজিমালিকরা বেশী লাভজনক মনে করে। (৪) এই মুনাফার একাংশ নিজ দেশের শ্রমিককে দেওয়ায় পুঁজিবাদী দেশের শ্রমিকরাও মুনাফার শরিকে পরিণত হয়। এর ফলে "অভিজাত শ্রমিক" ও "শোষিত শ্রমিক" দুই ভাগ দেখা দেয়। অভিজাত শ্রমিকরা শোষক বুর্জোয়াদের সামিল হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক লেনিনের এই মতবাদের সমালোচনা করেন। তাঁরা বলেন যে, সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির মূলধন লগ্নী করার ইতিহাস পরীক্ষা করলে লেনিনের মত প্রমাণিত হয় না। ১৮৭০ খ্রীঃ পর ইংলন্ড, ফ্রান্স প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের মূলধনের প্রধান অংশ লগ্নী করা হয় দক্ষিণ আমেরিকা ও রাশিয়ায়। আমেরিকা বা রাশিয়া কোনদিন ইংলন্ড বা ফ্রান্সের উপনিবেশ ছিল না। অথচ এই বাড়তি মূলধন সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের নিজ উপনিবেশে ১৮৭০ খ্রীঃ পর তেমন লগ্নী করেনি। সুতরাং Glut of Capital বা বাড়তি মূলধন বিনিয়োগের জন্যে উপনিবেশ স্থাপিত হয় একথা প্রমাণিত হয় না। যে সকল দেশের উপনিবেশ ছিল না, যথা, ডেনমার্ক ও সুইডেন প্রভৃতি সেই সকল দেশের শ্রমিকদের জীবন-যাত্রার মান ছিল বেশ উঁচু। অপর দিকে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম প্রভৃতি সাম্রাজ্যবাদী দেশের শ্রমিকের জীবন-যাত্রার মান ছিল নীচু। লেনিন তত্ত্ব অনুযায়ী এই সাম্রাজ্যবাদী শিল্পোন্নত দেশগুলির শ্রমিকের জীবন-যাত্রার মান উন্নত হওয়াই উচিত ছিল। সুতরাং লেনিন তত্ত্বের বাস্তব প্রমাণ দেখা যায় না। শিল্প-বিপ্লব ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভব ঊনবিংশ শতকে হয়। তার আগে কেন উপনিবেশ স্থাপিত হয়, লেনিন তত্ত্বে তার ব্যাখ্যা নেই। ডেভিড টমসন বলেন যে, উপনিবেশ বিস্তারের ইতিহাস লেনিন তত্ত্বকে সমর্থন করেনি। ১৮১৫-১৮৭০ পর্যন্ত ফ্রান্স শিল্পগঠনের দিক থেকে ছিল ব্রিটেন ও জার্মানীর অনেক পিছনে। অথচ এই সময়ে ফ্রান্স তার উপনিবেশের পরিমাণ প্রায় দ্বিগুণ বাড়ায়। এই সময় ফ্রান্সের হাতে না ছিল উদ্বৃত্ত মূলধন, না ছিল উদ্বৃত্ত শিল্প সম্পদ যা সে উপনিবেশে লগ্নী করতে পারত। ১৮৭০ খ্রীঃ পরও ফরাসী জনমত ঘোরতর উপনিবেশ বিরোধী হলেও লিও গ্যামবেটা, জুলেস ফেরি আনাম, টংকিং, টিউনিসিয়ায় উপনিবেশ স্থাপন করেন। ব্রিটেনের কথা বিচার করলে দেখা যাবে যে, ব্রিটেন তার উপনিবেশ কানাডা, অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডকে উপনিবেশবাদের কঠোর নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করে "ডোমিনিয়ন ষ্ট্যাটাস" দান করে। তার কারণ ছিল যে, ব্রিটেন বুঝতে পারে এই উপনিবেশগুলিকে অর্দ্ধ স্বাধীনতা দিলে তাদের সঙ্গে বাণিজ্য বাড়বে। উপনিবেশের একচেটিয়া কাঠামোর মধ্যে ধরে রাখলে এই সকল দেশে ব্রিটেনের মাল রপ্তানি হ্রাস পাবে। ব্রিটেন জানত যে, আমেরিকা স্বাধীনতা লাভ করার পর সেই দেশে ব্রিটিশ মালের রপ্তানি বহুগুণ বাড়ে। এই অভিজ্ঞতা ব্রিটেন, কানাডা প্রভৃতি উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে উপনিবেশে একচেটিয়া বাণিজ্যিক অধিকার বিস্তার অপেক্ষা শিথিল উপনিবেশ রপ্তানির বেশি অনুকূল ছিল। উপনিবেশ না থাকলেও রপ্তানি বাণিজ্য অব্যাহত ছিল। ভারতের রেলপথ নির্মাণের জন্যে ব্রিটিশ মূলধনের লগ্নী লাভজনক হলেও, আর্জেন্টিনার রেলপথ নির্মাণের জন্যে ব্রিটিশ লগ্নী কম লাভজনক ছিল না। অথচ আর্জেন্টিনা ব্রিটেনের উপনিবেশ ছিল না। জার্মানীর মূলধন ও রপ্তানি বিস্তারের ক্ষেত্রেও লেনিন তত্ত্ব কার্যকরী নয়। বলকান, পূর্ব ইওরোপ ও তুর্কী সাম্রাজ্যে জার্মানীর উদ্বৃত্ত মূলধন লগ্নী হয় ও উদ্বৃত্ত শিল্পদ্রব্য রপ্তানি হয়। অথচ এই দেশগুলি কোনদিন জার্মানীর উপনিবেশ ছিল না। ব্রিটেন বা ফ্রান্সের মত আমেরিকা চীনের ভূখণ্ড অধিকার না করেও তার "Open door" বা "খোলা দ্বার" নীতির সাহায্যে চীনে প্রচুর শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি বাজার লাভ করে।

এই সকল যুক্তি প্রয়োগ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হয় যে, সাম্রাজ্যবাদের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ একমাত্র কারণ নয়। অন্যান্য কারণেরও যথেষ্ট গুরুত্ব আছে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর লেনিন তাঁর মতবাদ অনুযায়ী প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণকে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে উদ্বৃত্ত মূলধন বিনিয়োগ ও উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির তত্ত্ব প্রচার করেন।

অর্থনৈতিক তত্ত্ব নব সাম্রাজ্যবাদের একমাত্র কারণ না হলেও, একটি প্রধান কারণ ছিল এতে সন্দেহ নেই। জনসংখ্যার বিস্তার অথবা কাঁচামালের প্রয়োজন মেটাতে ১৮৭০ খ্রীঃ পর উপনিবেশ বিস্তারের ধুম পড়ে যায়, এই মত সমর্থনযোগ্য নয়। কারণ এশিয়া, আফ্রিকার জলবায়ু, ভূ-প্রকৃতি শ্বেতাঙ্গদের বসবাসের অনুকূল ছিল না। যদিও এশিয়া, আফ্রিকায় উৎপন্ন রাবার, রেশমতন্তু, উদ্ভিজ্য তৈল, খনিজ সম্পদ প্রভৃতি কাঁচামাল ইওরোপীয় শিল্প কারখানার পক্ষে প্রয়োজনীয় ছিল, তথাপি সেই কাঁচামাল শিল্প সামগ্রীর বিনিময়ে লভ্য ছিল। এর জন্যে উপনিবেশ স্থাপনার দরকার ছিল না। তুলনামূলকভাবে এই সকল উপনিবেশে উদ্বৃত্ত মূলধন লগ্নী করে, অথবা কারখানায় তৈরি শিল্পদ্রব্য একচেটিয়া বিক্রি করে বেশি মুনাফা লভ্য ছিল। সুতরাং যখন আমরা সাম্রাজ্যবাদ বা উপনিবেশ বিস্তারের পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণের কথা বলি তখন একচেটিয়া ব্যাপারটিকে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতে পারি।

প্রশ্ন হল অকস্মাৎ ১৮৭০ খ্রীঃ পর শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি বাজার দখলের জন্যে এত মারাত্মক প্রতিযোগীতা কেন শুরু হল। কেন ১৮৭০ খ্রীঃ এর আগে তা দেখা যায়নি। এই প্রশ্নের উত্তর আংশিক অর্থনৈতিক ও আংশিক রাজনৈতিক তথ্যের মধ্যে পাওয়া যাবে। শিল্প-বিপ্লবের আগে জার্মানী ছিল প্রচুর ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্যের বাজার। ফ্রান্সও ছিল ইংলন্ডের পশম ও যন্ত্রপাতির খরিদ্দার। কিন্তু নিজ দেশে শিল্প-বিপ্লব হলে ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি দেশে ব্রিটিশ মালের চাহিদা কমে। জার্মানী সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করে বিদেশ থেকে আমদানি মালের ওপর চড়া হারে শুল্ক বসালে এই সকল দেশে ব্রিটেনের বাজার নষ্ট হয়। এজন্য ব্রিটেনকে আফ্রো-এশিয় ঔপনিবেশিক বাজার দখল করতে হয়। সেই বাজারে অন্য দেশের প্রতিযোগীতা বন্ধ করে নিরাপদ একচেটিয়া বাজার দখলে রাখার জন্যে উপনিবেশগুলিকে রাজনৈতিক অধিকার স্থাপন করা হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ পর উপনিবেশ দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতার এটি একটি বড় অর্থনৈতিক কারণ ছিল। নতুন শিল্পজাত দেশগুলি যথা জার্মানী প্রভৃতি দেশেও উদ্বৃত্ত মাল বিক্রির জন্যে বাজারের দরকার হয়। এজন্য এশিয়া-আফ্রিকার দেশগুলির দিকে সকলের নজর পড়ে।

অর্থনৈতিক কারণের সঙ্গে রাজনৈতিক কারণ যুক্ত হলে উপনিবেশ দখলের উদ্যম দ্বিগুণ হয়। ১৮৭০ খ্রীঃ ফ্রাঙ্কো-জার্মান যুদ্ধের পর ইওরোপের প্রধান দেশগুলির মধ্যে রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দেয়। ফ্রান্স-জার্মান যুদ্ধের পর ইওরোপের বৃহৎ শক্তিগুলির মধ্যে এক অঘোষিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা, পারস্পরিক সন্দেহ থাকায় বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ঘাঁটি উপনিবেশের সম্পদ দখল করে নিজ নিজ রাষ্ট্রের শক্তি ও সম্পদ বৃদ্ধির জন্যে প্রতিযোগীতা শুরু হয়। এই সময় (১৮৮৩ খ্রীঃ) জন সিলী (John Seeley) নামক চিন্তাবিদ এই মত প্রচার করেন যে, মার্কিন দেশ ও রাশিয়ার যেরূপ দ্রুত ক্ষমতা বাড়ছে তার ফলে শীঘ্রই তারা, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও জার্মানীকে ছাড়িয়ে যাবে। ভবিষ্যতে এমন দিন আসতে পারে যেদিন ডেনমার্ক বা গ্রীসের ন্যায় ইংলন্ড বা ফ্রান্স একটি সাধারণ দেশে পরিণত হবে। সুতরাং উপনিবেশ দখল করে লোকবল, সম্পদ, সামরিক ঘাঁটি না বাড়ালে ব্রিটেন বা ফ্রান্স বা জার্মানী তাদের বর্তমান মর্যাদা ও আধিপত্য বজায় রাখতে পারবে না। এই মতবাদ দেশের শাসকগোষ্ঠীকে বিশেষ প্রভাবিত করে। ফলে অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে রাজনৈতিক স্বার্থ সংযুক্ত হয়।

ইতালী, রাশিয়া প্রভৃতি দেশগুলির ক্ষেত্রে উপনিবেশ দখলের উদ্যোগ ছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক কারণে। এই দুই দেশের মূলধন ও সম্পদ এমন উদ্বৃত্ত ছিল না যে তা অন্য দেশে

লগ্নী করা ছিল বাধ্যতামূলক। নরওয়ের হাতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম নৌ-বহর থাকলেও নরওয়ে উপনিবেশ বিস্তারে আগ্রহ দেখায়নি। জার্মানী শিল্পে ফ্রান্স ও বেলজিয়াম অপেক্ষা অনেক বেশী এগিয়ে থাকলেও, এই দুই দেশ অপেক্ষা অনেক দেরীতে উপনিবেশ দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যোগ দেয়। অর্থাৎ নিছক অর্থনৈতিক কারণে সাম্রাজ্যবাদ ঘটলে নরওয়ে বা জার্মানী সবার আগেই উপনিবেশ দখলের কাজে ঝাঁপ দিত। আসলে রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা দেখা দিলে তবেই অর্থনৈতিক বাধ্য-বাধকতাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যতদিন না রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা দেখা দেয় ততদিন রাজনীতিকরা অর্থনৈতিক কারণকে গুরুত্বহীন মনে করেন।

এই রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা কি ছিল? ডেভিড টমসনের মতে, "উপনিবেশ দখলের জন্যে নগ্ন ক্ষমতার লড়াই (১৮৭০ খ্রীঃ পর ছিল) ইওরোপের মধ্যে বৃহৎ শক্তিগুলির আন্তঃরাষ্ট্রীয় সংঘাত ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিফলন" (The naked power politics of the new colonialism were the projection unto an overseas screen, of the inter-state fictions and rivalries of Europe)। ইওরোপের ক্ষেত্রে নগ্ন রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব উপনিবেশের ক্ষেত্রে প্রসারিত হয়। জার্মানী, ইতালী প্রভৃতি দেশগুলি মনে করত যে, উপনিবেশ অধিকার না করলে তাদের শক্তি বাড়বে না; আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাদের সম্মান থাকবে না। এজন্যে এই দেশগুলি উপনিবেশ দখলের জন্যে বিশেষ চেষ্টা করে। ফ্রান্স মনে করত যে, জার্মানী অপেক্ষা তার লোকবল কম। উপনিবেশ অধিকার করে সেই দেশের লোকদের সামরিক শিক্ষা দিয়ে নিজ সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি ছিল ফ্রান্সের অভিলাষ। ব্রিটেনও ভারতীয় সেনার দ্বারা তাহার বাণিজ্য ও সাম্রাজ্য রক্ষা করত। উপনিবেশের সম্পদ আহরণ করে তার নিজ নিজ দেশের অর্থবল বৃদ্ধির চেষ্টা করে বিশ্বের বিভিন্ন জলপথের ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন, নৌ-শক্তির আধিপত্য স্থাপনের জন্যে সামরিক ঘাঁটি দখলও ছিল উপনিবেশবাদের অন্যতম কারণ। এই সামরিক ঘাঁটিগুলির সাহায্যে বাণিজ্য ও রাজনৈতিক আধিপত্যকে সুরক্ষিত করা যেত। ব্রিটেন পূর্ব ভূমধ্যসাগরের জলপথ সুরক্ষিত করতে সাইপ্রাস ও পশ্চিম ভূমধ্যসাগরে মাল্টাদ্বীপ অধিকার করে। ফ্রান্স উত্তর আফ্রিকায় আলজেরিয়াকে কেন্দ্র করে তার আধিপত্য স্থাপন করে। পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ব্রিটিশ আধিপত্যের জন্যে ব্রিটেন ভারত, সিংহল, মালয়কে ব্যবহার করে।

রাজনৈতিক কারণ

সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের অন্যান্য কারণগুলির মধ্যে মিশনারী বা খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারকদের প্রভাব এবং আবিষ্কারকদের প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ্য। ব্রিটিশ ধর্ম প্রচারক ডেভিড লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যানলি, ফরাসী ধর্ম প্রচারক ল্যাভিজেরিক (Cardinal Lavigeric) প্রভৃতি ধর্মপ্রচারের জন্যে আফ্রিকায় যান। তাঁদের পিছু পিছু ইওরোপীয় বণিক শ্রেণী আফ্রিকায় ঢুকে পড়ে।

মিশনারীদের ধর্মপ্রচারে আগ্রহ

উদ্যমী প্রশাসকগোষ্ঠী যথা—সেসিল রোডস, ট্রান্সভালে; লর্ড ক্রেমার, মিশরে; লর্ড লুগার্ড, নাইজেরিয়ায়; লর্ড লিনার, উত্তমাশা অন্তরীপে; জার্মান কার্ল পিটারস, পূর্ব আফ্রিকায় নিজ উদ্যমে সাম্রাজ্য বিস্তার করেন। লোকসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেকার সমস্যার সমাধ্যনের জন্যেও উপনিবেশ স্থাপনের আগ্রহ দেখা দেয়। সাম্রাজ্য স্থাপন বৃহৎ শক্তিগুলির পক্ষে মর্যাদার প্রশ্ন হিসেবে দেখা দেয়। কোন দেশের উপনিবেশ না থাকলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাকে মর্যাদা দেওয়া হত না। এই কারণেও সাম্রাজ্য বিস্তারের উদ্যম দেখা দেয়। সর্বশেষে, এশিয়া ও আফ্রিকায় ১৮৭০ এর পর উপনিবেশবাদ ঘনীভূত হয়। তার কারণ ছিল এই দুই মহাদেশে বিভিন্ন শক্তির মধ্যে ভাগ করার মত প্রচুর উপনিবেশ ছিল। আর ছিল শিল্পের প্রয়োজনে বিরাট কাঁচামালের সম্ভার এবং বিশাল বাজার।

অভিযান স্পৃহা

ডেভিড টমসন এজন্যে মন্তব্য করেছেন যে, সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ও প্রকৃতি কেবল অর্থনৈতিক কারণে ঘটেনি। একাধিক কারণে ঘটে। ১৯১৮ খ্রীঃ পর যদিও বলা হয় যে "সাম্রাজ্য দখলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ডেকে আনে" তা হল একটি অর্দ্ধসত্য মাত্র। যুদ্ধ-জনিত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলেই সাম্রাজ্য অর্জিত হয় একথাও সাম্রাজ্যবাদের ক্ষেত্রে অপর একটি সত্য। অর্থনৈতিক কারণ ও রাজনৈতিক কারণের সহবস্থান (Co-Existence) সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব ঘটায়। এই সঙ্গে বলা দরকার যে আবিস্কারক, বৈজ্ঞানিক, অনুসন্ধানকারী ও ধর্মপ্রচারকরা নিজ নিজ প্রেরণায় অজ্ঞাত দেশ আবিষ্কার অথবা সেই সকল দেশে ধর্মপ্রচারের মানবিক আবেগে জীবন বিপন্ন করে চলে যান। তাঁরা বণিক বা সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে আফ্রিকার গহন অরণ্যে, কঙ্গো নদীর অজানা, ভয়ঙ্কর উপত্যকায় একাকী ঢুকে পড়েন একথা ঠিক নয়। মানবিক প্রেরণায়, দাস প্রথার প্রতিবাদে, ধর্মপ্রচারের জন্যেই তাঁরা অভিযান করেন। পরে তাঁদের পিছু নিয়ে বণিক ও সাম্রাজ্যবাদীরা সেই সকল অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। সুতরাং, পতাকা বাণিজ্যকে অনুসরণ করেনি, বাণিজ্যই পতাকাকে অনুসরণ করে। উদ্ভিদ বিজ্ঞানী, জলদস্যু, ধর্ম প্রচারকের পদচিহ্ন ধরে পতাকা অনুসরণ করে। পতাকাটিকে অনুসরণ করে বাণিজ্যের হস্ত প্রসারিত হয়।"[১]